ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, February, 2026, Page No. 21- 26
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.264

‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’-নাটকে পরিবেশভাবনা ও কালিদাস

নীলিমা সরকার, *সহকারী অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ, সামসী কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 23.12.2025; Accepted: 03.01.2026; Available online: 28.02.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The intimate bond between life and the abiotic elements of the environment—such as light, heat, air, and humidity—is undeniable. It is through the proper coexistence and balance of these elements that vital life energy has manifested on Earth, visibly embodied in plants and animals. The existence of plants and animals depends on soil, water, light, air (including oxygen and carbon dioxide), and food. Plants produce food with the help of sunlight, water, soil, and carbon dioxide released by animals. On the other hand, animals carry out respiration using the oxygen emitted by plants and also depend on plants as a source of food.

Thus, plants and animals are mutually bound to each other and to abiotic elements in a relationship of equilibrium. Even the slightest disturbance in this balance renders the course of life vulnerable. In modern civilization, empowered by science and advanced technology, we—so-called civilized beings—have attempted to dominate nature in pursuit of artificial comfort, and in return have handed over to it the authority to determine the very assurance of our existence.

The poet of nature, Kalidasa, through his portrayal of nature’s social ecology, advocated the protection of nature and the maintenance of social balance. Through my research paper, a modest attempt has been made to echo this celebration of the environment.

Keywords: Life, Energy, Love, Universe, Sanctuary

পরি উপসর্গ পূর্বক বিশ্ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় যোগে ‘পরিবেশ’ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ‘বেষ্টন’ বা ‘পরিবৃতি’ অর্থাৎ, যা কিছুর দ্বারা এই দৃশ্যমান জগৎ পরিবৃত বা বেষ্টিত তাকেই বলে পরিবেশ। যে বেষ্টনীর মধ্যে একদিকে রয়েছে প্রাণী ও উদ্ভিদ থেকে শুরু করে ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক প্রভৃতির মত সজীব উপাদান অন্যদিকে আলো, বাতাস, জল, মাটি প্রভৃতির মত অজীব বা জড় উপাদান। পরিবেশ বিজ্ঞানের মতানুসারে- “একটি জীবের পরিবেষ্টক এবং প্রভাব বিস্তারকারী সজীব এবং জড় উপাদানের মোট সমষ্টি বা যোগফলকে ঐ জীবের পরিবেশ বলা হয়।”[১] সজীব উপাদান অর্থাৎ, জীবনের বিকাশ এবং তার অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে অজীব বা জড় উপাদানগুলির জীবনের প্রতি অনুকূল গুণগত ও পরিমাণগত মানের উপর এবং তাদের পারস্পরিক সূক্ষ্ম সমতার উপর। এই উপাদানগুলির গুণগত ও পরিমাণগত মাত্রার এবং সমতার তারতম্য ঘটলে স্বাভাবিকভাবেই জীবন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, দেখা দেয় তার অস্তিত্বের সংকট। এমতাবস্থায় জীবন-ধারাকে নিরবচ্ছিন্ন রাখতে পরিবেশগত আনুকূল্য বজায় রাখাটা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে।

সত্যই আমরা আজ পরিবেশের এমন এক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অবস্থান করছি যেখানে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যত দ্রষ্টারা পৃথিবী ধ্বংসের দিন ঘোষণা করলে বিজ্ঞানীরাও আর তাকে বাতুলতামাত্র বলে অনায়াসে উপেক্ষা করতে সাহস করছেন না। কারণ নির্দিষ্ট দিনক্ষণটুকু বাদ দিয়ে পূর্বঘোষিত সেই বিপর্যয়ের অনুকূলে এমন কিছু সম্ভাব্য কারণ তারা দেখতে পাচ্ছেন যেগুলিকে তারা অশনিসংকেত বলেই মনে করছেন। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির নিরন্তর পেট্রোল ও কয়লার অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রাকে ত্বরিত গতিতে এতটাই বৃদ্ধি করে চলেছে যে, এই ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রার ভ্রূকুটি প্রদর্শনে ভয়ভীত বিজ্ঞানীরাও। ২০০৯-এ রাষ্ট্রসংঘের ঘোষণা অনুযায়ী 'গ্রীণ হাউস এফেক্ট', পৃথিবীবাসীর নিকট আজ অতি পরিচিত এক শব্দবন্ধ। এর একবিংশ শতাব্দীর শেষপর্যায়ে পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বেড়ে দাঁড়াবে ৩° সেলসিয়াস।[২] ভয়ঙ্কর পরিণাম সম্পর্কেও তারা অবগত। প্রমাদগুণে বিজ্ঞানীরা প্রতিটি দেশকে 'গ্রীণ হাউস গ্যাস' উৎপাদনের মাত্রা নির্দিষ্ট করে তা মেনে চলার প্রস্তাব দিয়েছেন, তথাপি তাকে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে না।

বিজ্ঞানের পরিসংখ্যান বলছে তাপমাত্রার এইরূপ বৃদ্ধির হার অপরিবর্তিত থাকলে পরিবর্তন ঘটবে সমুদ্রপৃষ্ঠে। উষ্ণায়নের কারণে মেরুপ্রদেশে অতিমাত্রায় বরফ গলনের ফলে এতটাই বৃদ্ধি পাবে জলতলের উচ্চতা যে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্থলভূমিগুলির অধিকাংশেরই নিশ্চিতভাবে সলিলসমাধি ঘটবে। এখানে উল্লেখ্য যে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ তার মধ্যে একটি। বিশেষতঃ সুন্দরবন প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বৈজ্ঞানিক তথ্য অনুসারে সুন্দরবনের ৯৬% বিলুপ্ত হয়ে যাবে।[৩] যাতে বিনষ্ট হবে একটি বিরাট অংশের বাস্তুতন্ত্র। পৃথিবীর অন্যান্য ভূখণ্ডের পট-পরিবর্তনটাও প্রায় একই প্রকার।

বিজ্ঞানীরা অনাগত যে বিপর্যয়গুলি উল্লেখ করেছেন সেগুলি আর সম্ভাব্য নয়, অবশ্যম্ভাবী এবং অপ্রতিরোধ্যও। তথাপি তার ভয়াবহতার প্রকটতাকে কিছুটা প্রশমিত করার প্রয়াসে দূষণ রোধের জন্য বিজ্ঞানীরা বিবিধ উপায় নির্দেশ করেছেন। তাদের সতর্কবার্তায় বর্তমানে কিছুটা সক্রিয় হচ্ছে রাষ্ট্রগুলি। জনগণকে বিভিন্নভাবে সচেতন করা হয়েছে এবং রাষ্ট্রনৈতিক স্তরে গ্রহণ করা হয়েছে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রসংঘের মনুষ্য-পরিবেশ সম্পর্কিত অধিবেশনে "পরিবেশ-সুরক্ষা আইন" ঘোষিত হয় সেই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে আইনটি প্রণীত হয় ১৯৮৬ সালের ২৩শে মে। যা ভারতীয় সংবিধানের ২৫৩নং ধারার অন্তর্ভুক্ত। তাই বর্তমানের মানুষ যে পরিবেশ সম্পর্কে অল্পবিস্তর সচেতন তা বলাই যায়। বর্তমান থেকে যদি কিছুটা পিছনে তাকাই তাহলে দেখা যাবে সেই সময়ের মানুষের মধ্যেও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তৎকালীন সাহিত্যকীর্তির মধ্যেই তার সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে। সে পরিচয় বাল্মীকি-ব্যাস প্রণীত রামায়ণ-মহাভারতে যেমন বিধৃত, সেই প্রকার তৎপরবর্তীকালীন কবিকীর্তিতেও সম্যকরূপে প্রস্ফুটিত হয়েছে। তন্মধ্যে মহাকবি কালিদাসের রচনাসমূহ সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। বিশেষতঃ তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'[৪] নাটকে পরিবেশ সম্পর্কে কবির সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় সমধিক লক্ষ্য করা যায়। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে মহাকবি কালিদাসের এই বিশিষ্ট পরিবেশ মনস্কতাকে অবলম্বন করেই আমার বর্তমান প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। নাটকের প্রারম্ভেই মঙ্গলাচরণদৃশ্যে কবিকৃত শ্লোকটি হল-

"যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবি যা চ হোত্রী,
যে দ্বে কালং বিধত্তঃ, শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্।
যামাহুঃ সর্বভূতপ্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ,
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ।।"[৫]

এখানে জল, অগ্নি, যজমান, চন্দ্র ও সূর্য, বায়ু, আকাশ এবং পৃথিবী এই অষ্টমূর্তি বিশিষ্ট ঈশ্বরের নিকট সকলের রক্ষার্থে প্রার্থনা করা হয়েছে। আলংকারিক বিধি অনুযায়ী এটি মঙ্গলাচরণ শ্লোক হলেও নিছকই মঙ্গলাচরণের

উদ্দেশ্যে এই শ্লোক রচিত হয়নি। একটু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে এর আপাত সরল এবং নাটকীয় তাৎপর্যবাহী অর্থের অন্তরালে রয়েছে অন্য এক গভীর অর্থ। জীবনের সৃজন, পালন ও রক্ষণে যে প্রকৃতিই প্রথম এবং শেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে এই বাস্তব সত্যিটাকে তুলে ধরাই কবি তাঁর কর্তব্য বলে মনে করেছেন। এই কর্তব্য বোধই পরিবেশের প্রতি তাঁর গভীর সচেতনাবোধের পরিচয় বহন করে। সকলের সুরক্ষার নিমিত্ত আলো, বাতাস, আকাশ, মাটি প্রভৃতি অষ্টমূর্তিবিশিষ্ট ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনার মধ্য দিয়ে এই বাস্তব সত্যই তিনি ব্যক্ত করেছেন যে, জীবন একমাত্র প্রকৃতিরই আশীর্বাদধন্য। জীবনের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় থাকা ঈশ্বর কোন অলৌকিক শক্তি নয়, তা প্রকৃতিরই শক্তিমাত্র।

বিপন্নতা সম্পর্কে কবিচিত্ত সদা সচেতন। আলোচ্য নাটকে বিভিন্নভাবে সেই সচেতনতার প্রকাশ ঘটেছে। প্রথম অঙ্কে আমরা দেখি শকুন্তলা ও তার দুই সখী অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা তপোবনাশ্রমের চারাগাছগুলিতে জল সিঞ্চনে রত। এই অবস্থায় প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে লঘুচ্ছলে বলছে-

> "হলা শকুন্তলে, তত্ত্বতঃ অপি তাতকাশ্যপস্য আশ্রমবৃক্ষকাঃ প্রিয়তরেতি তর্কয়ামি যেন নরমালিকাকুসুমপেলরা অপি ত্বম্ এতেষাম্ আলবালপূরণে নিযুক্তা।"[৬]

অর্থ হল– ওহে শকুন্তলা, পিতা কাশ্যপের নিকট তোমার অপেক্ষা আশ্রমের গাছগুলি অধিক প্রিয় বলেই মনে হচ্ছে। কারণ নবমালিকাকুসুমপেলব তোমাকেও গাছগুলির জল সিঞ্চনে নিযুক্ত করেছেন তিনি। এখানে কার প্রতি কণ্ঠ স্নেহাধিক্য প্রদর্শন করেছেন তা বিচার্য নয়। যে বিষয়টি এখানে লক্ষণীয় তা হল, কবি মানবজাতি অপেক্ষা উদ্ভিদকে তথা প্রকৃতিকে কোন অংশেই ন্যূন করে দেখেননি। উদ্ভিদের পরিচর্যায় মানুষকে নিয়োগ করেছেন। প্রিয়ংবদার উক্তপ্রকার উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে শকুন্তলার উক্তিটিও এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, যা হল-

> "ন কেবলং তাতনিয়োগ এব, অস্তি মে সোদরস্নেহোহপি এতেষু।"[৭]

অর্থাৎ কেবল পিতা নিয়োগ করেছেন বলে নয়, এদের প্রতি আমারও সহোদর স্নেহ আছে। শকুন্তলার এই সংলাপে মানব ও প্রকৃতির অন্তর্বর্তী সীমারেখা মুছে গিয়ে রচিত হয়েছে আত্মীয়তার এক গভীর বন্ধন। এইরূপ নাটকের অন্যত্রও দেখা যায় কখনো শকুন্তলা লতাকে ভগিনীরূপে সম্বোধন করে, কখনো বা লতাভগিনীর নামকরণে ব্যাপৃত হয়। গাছেদেরকে জল পান না করিয়ে সে জল পান করে না, সাজতে ভালোবাসলেও একটি পত্রও ছিন্ন করে না। গাছেদেরকেও মানুষের প্রতি অনুরূপ আচরণ করতে দেখা যায়। যেমন চতুর্থ অঙ্কে পতিগৃহে যাত্রার উদ্দেশ্যে তপোবন থেকে বিদায় নেওয়ার প্রাক্কালে শকুন্তলাকে বধূসাজে সাজাতে বনস্পতিরা প্রদান করে প্রয়োজনীয় প্রসাধনী, বস্ত্র, অলংকার। মহর্ষি কণ্ঠ বনবাসবন্ধু তথা বনস্পতিদের নিকট শকুন্তলাকে বিদায়ের অনুমতি প্রদান করতে বললে কুহুরবে সে সম্মতি জ্ঞাপিত হয়। শকুন্তলার বিদায়ে বিচ্ছেদ বেদনায় ব্যথাতুর বনলতা পত্ররূপ অশ্রুবিসর্জনের দ্বারা সমবেদনা জ্ঞাপন করে "অপসৃতপাণ্ডুপত্রা মুঞ্চন্ত্যশ্রূণীব লতাঃ।"[৮] এইরূপে কবি গাছ তথা প্রকৃতি ও মানবের মাঝে এক সুদৃঢ় আত্মীয়তার বন্ধন রচনা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কবির এই প্রয়াস নিছকই কাব্যিক সুষমা সৃষ্টিতে আপন উৎকর্ষতা প্রমাণের নিমিত্ত বলে মনে হয় না। আমি মনে করি উদ্ভিদ ও মানুষের মাঝে সম্পর্কের আত্যন্তিক নৈকট্য রচনার মাধ্যমে কবি এক মহৎকৌশলে প্রকৃতি তথা সবুজের সুরক্ষাকে কিছুটা সুনিশ্চিত করে নিতে চেয়েছেন।

সবুজ সংরক্ষণ ও সবুজায়ন মাত্র নয়, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে প্রাণী সংরক্ষণও যে অপরিহার্য-এই বিষয়েও কবির সজাগ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আমরা পেয়েছি তাঁর 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকে। নাটকের শুরুতেই দেখা যায় মৃগয়াবিহারি রাজা দুষ্যন্ত রথারূঢ় অবস্থায় ধনুতে বাণ সংযোজন পূর্বক এক কৃষ্ণসার মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করে শর নিক্ষেপে উদ্যত। ইত্যবসরে শুনতে পেলেন বৈখানসের অমোঘ নিষেধবাণী- "আশ্রমমৃগো হয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ।"[৯] অর্থাৎ, এটি আশ্রমের মৃগ, মারবেন না, মারবেন না। শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ তিনি মৃগবধ

হতে বিরত হলেন। এই দৃশ্যপট নাট্য প্রয়োজনে সংযোজিত ঠিকই, কিন্তু নাট্যোদ্দেশ্য সিদ্ধিই এর একমাত্র লক্ষ্য নয়। এই দৃশ্যপটের নেপথ্যে কবিকণ্ঠে উদ্ঘোষিত হয়েছে এক কঠোর নিষেধাজ্ঞা, যা হল- শাসক হোক বা সাধারণ মানুষ, নিতান্ত বিনোদনের জন্য অহেতুক বন্যপ্রাণী হত্যায় কোন ব্যক্তিরই বিন্দুমাত্রও অধিকার নেই। এই আলোচনায় সপ্তমাঙ্কের একটি দৃশ্যাংশের উল্লেখ ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। দৃশ্যটি এরূপ, হেমকূট পর্বতস্থিত মহর্ষি মারিচের তপোবনাশ্রম। আশ্রমে প্রবেশকালে মহারাজ দুষ্যন্তের দৃষ্টিগোচর হল এক বিস্ময়কর দৃশ্য। এক বালক মাতৃদুগ্ধ অর্ধেক পান করেছে এমন এক সিংহশাবকের কেশর ধরে পীড়ন করতে করতে বলপূর্বক আকর্ষণ করে নিয়ে চলেছে খেলার নিমিত্ত এবং তার দন্তগণনার জন্য তাকে মুখব্যাদন করতে বলছে। সিংহ শাবকটির উপর এইপ্রকার উৎপীড়ন দেখে বালকটির সঙ্গে থাকা এক তাপসী বালকটিকে পীড়ন ক্রিয়া থেকে বিরত হওয়ার জন্য বলছে "অবিনীত! কিং নঃ অপত্যনির্বিশেষানি সত্ত্বাণি বিপ্রকরোষি?"[১০] অর্থ হল, ওরে অবাধ্য! আমরা যে পশুগুলিকে নিজসন্তান তুল্য স্নেহ করি তাদের উপর কেন উৎপীড়ন করছ? এতৎ সত্ত্বেও সে নিবৃত্ত না হওয়ায় তাপসীরা তাকে ভয় ও লোভ প্রদর্শনের দ্বারা বিরত করার চেষ্টা করছে। এখানে নাটকীয় বক্তব্য যাই হোক না কেন একটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে প্রতীত হয় যে, সংবেদনশীল কবির নিকট বন্যপ্রাণীদের প্রতি সামান্য বালকের উৎপীড়নও সমর্থনযোগ্য নয়।

বর্তমান সময়ে পরিবেশ ভাবনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল অভয়ারণ্য। বন্যজীবনকে স্বাভাবিকতা ও সুরক্ষা প্রদান করতে রাষ্ট্রগুলির এ এক শুভ প্রচেষ্টা বলা যায়। কবিচিত্তেও অভয়ারণ্যের ধারণার ছায়াপাত ঘটেছে। তাঁর 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকে চিত্রিত তপোবনের পারিপার্শ্বিক চিত্র, জীবনযাত্রা ও কার্যাবলী কবির এই ধারণার সুস্পষ্ট বাহক।

নাট্যকাহিনির শুরুর দিকে দেখা যায় বৈখানস কর্তৃক আমন্ত্রিত রাজা মালিনী নদীতীরস্থ কণ্বাশ্রমের অভিমুখে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে যে স্থানটিতে উপস্থিত হন সেই স্থানটিই যে তপোবন, এই প্রকার অনুমানের হেতু প্রদর্শনকল্পে সারথিকে বলছেন-

"নীবারাঃ শুকগর্ভকোটরমুখভ্রষ্টাস্তরূণামধঃ,
প্রস্নিগ্ধাঃ ক্বচিদিঙ্গুদীফলভিদঃ সূচ্যন্ত এবোপলাঃ।
বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে মৃগা-
স্তোয়াধারপথাশ্চ বল্কলশিখানিষ্যন্দরেখাঙ্কিতাঃ।।"[১১]

অর্থাৎ শুকপাখীর গর্ভকোটর হতে তার মুখভ্রষ্ট নীবার ধান তরুতলে পড়ে আছে। মসৃণ উপলক্ষণগুলি সূচিত করছে যে সেগুলি ইঙ্গুদী ফল ভাঙতে ব্যবহৃত হয়, মানুষের সংস্পর্শে থাকার কারণে মানুষের প্রতি বিশ্বাস জন্মানোয় মৃগকুল রথের শব্দকে সহ্য করছে, ভীত হয়ে যুথভঙ্গ হচ্ছে না ইত্যাদি। দুষ্যন্ত কৃত এই উক্তিটিতে সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে মৃগকুলের ভয়হীন, শঙ্কাহীন নিরুপদ্রব জীবনযাত্রা, পক্ষীকুলের অনুকূল বাসস্থান ও উপযুক্ত আহার সহযোগে নির্বিঘ্ন ও নিশ্চিন্ত জীবনযাপন। এদের জীবনের নিশ্চিন্ততা আরো ধরা পড়ে যখন কণ্বমুনি শকুন্তলার বিদায়কালে তার গতিরোধকারী মৃগশিশুর পরিচয় দিয়ে বলেন-

"যস্য ত্বয়া ব্রণবিরোপণমিঙ্গুদীনাম্,
তৈলং ন্যষিচ্যত মুখে কুশসূচিবিদ্ধে।
শ্যামাকমুষ্টিপরিবর্ধিতকো জহাতি
সোহয়ং নপুত্রকৃতকঃ পদবীং মৃগস্তে।।"[১২]

অর্থাৎ, যার মুখ কুশের ডগায় ক্ষতবিক্ষত হলে তুমি ক্ষতনিবারক ইঙ্গুদীর তেল লাগাতে, শ্যামাধানের মুঠি খাইয়ে তুমি যাকে বড় করেছো সেই তোমার নিজ পুত্রসম মৃগ পথ আটকাচ্ছে। এইভাবে আরণ্যকরা মাতৃহীন মৃগশিশুকে

সযত্নে পালন করে আবার কখনো সন্তানসম্ভবা মৃগবধূর আসন্ন প্রসব নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়। আমরা আরও দেখি আশ্রম হতে বিদায় নেওয়ার সময় শকুন্তলা তার লতাভগিনী বনজ্যোৎস্না তথা নবমালিকার কথা বিস্মৃত হয় না, সে ঐ লতার পরিচর্যার ভার অর্পণ করে দুই সখীর হাতে- "হলা এষা দ্বয়োঃ যুবয়োঃ ননু হস্তে নিক্ষেপঃ।"[১৩] এই খণ্ডচিত্রগুলি হতে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয় যে উদ্ভিদ ও প্রাণীর তথা বন্য জীবনের সংরক্ষণ ও সংবর্ধনের পক্ষে তপোবনরূপ পুণ্যভূমিই সর্বাপেক্ষা অনুকূল। পরিবেশ সম্পর্কিত এই বাস্তব উপলব্ধিই কবির তপোবন প্রীতির অন্যতম কারণ বলে আমার মনে হয়। তাই এই নাটকে তিনি একবার নয় একাধিকবার তপোবনের প্রেক্ষাপট রচনা করেছেন।

নাটকের ছত্রে ছত্রে বিবিধ প্রাকৃতিক পশুপ্রাণীর উল্লেখের মাধ্যমেও কবির প্রকৃতি সচেতনতা প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমাঙ্কে হরিণ, ঘোড়া, শুকপাখী, ভ্রমর, হস্তী ইত্যাদি প্রাণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার পাটলপুষ্প, শিরীষ, নীলপদ্ম, নবমালিকা, আম্রমুকুল প্রভৃতি ফুলের অনবদ্য বর্ণনা সত্যই মন হরণকারী। অন্যদিকে কুশঘাস, নীরব ধান গাছ, শমীগাছ, বকুলগাছ, সহকার বৃক্ষ, নবমালিকা লতা, ছাতিমগাছের বর্ণনা। এইভাবে দ্বিতীয় অঙ্কে শূকর, বাঘ, মহিষ, হরিণ, ভাল্লুক, মাছি প্রভৃতি পশুপ্রাণীর, আবার আকন্দফুল, নবমালিকা ফুল, বেতগাছ, মুথা ঘাস, কুরবর গাছের উল্লেখ পাওয়া যায়। তৃতীয় অঙ্কে পরিণ, শুকপাখি, ভ্রমর, পদ্মফুল, মাধবীলতা, কুমুদিনী ফুল, বেণামূল, কুশঘাস, বেতসলতা, মাধবীলতা, সহকার বৃক্ষ ইত্যাদির নিদর্শন লক্ষণীয়। চতুর্থ অঙ্কে কোকিল, হরিণশিশু, চক্রবাক পাখী, ময়ূর, নবমালিকা, কুমুদিনী, বকুলফুল, পদ্ম ফুল, নবমালিকা লতা, দুর্বার শিস্, নীবার ধান, সহকার বৃক্ষ, শ্যামাধান গাছ, ডুমুর গাছ, চন্দন গাছ। পঞ্চম অঙ্কে কোকিল, হস্তী, ভ্রমর, হরিণ, পদ্ম, কুন্দফুল, কুমুদ, প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে রাজহংস, বাঘ, হরিণ, পুরুষকোকিল, ভ্রমর, সর্প, কুকুর, রুইমাছ, শকুনি, হস্তী, মাছি, বিড়াল, ইঁদুর, আম্রমুকুল, শিরীষফুল, কমলিনী, কুরবক ফুল, আমগাছ, মাধবীলতা পাওয়া যায়। দৃশ্যকাব্যের অন্তিম অঙ্কে সিংহশিশু, চাতকপাখী, সর্প, ঘোড়া, হস্তী, মন্দার ফুল, সোনার পদ্ম, মন্দার বৃক্ষ, অশোক বৃক্ষ, চন্দন গাছ প্রভৃতির অনন্য উপস্থাপনা প্রকৃতির সৌন্দর্যকে জীবন্ত করে তুলেছে। তাই বলা যায়– কালিদাসস্য সর্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলম্। বিশ্বচরাচরে বিশ্বভাবনায় পরিবেশচিন্তনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন–

"নব বৎসরের কুঁড়ি, তারি একপাতে, বরষশেষের পক্ক ফল।
প্রাণ করে চুরি আর, তারি একসাথে প্রাণে এনে দেয় পুষ্টিবল।।
আছে স্বর্গলোক আর, সেই এক ঠাঁই, বাঁধা যেথা আছে মহীতল।
হেল য়দি কভু থাকে, তুমি তবে তাই, ওহে অভিজ্ঞান-শকুন্তল।।"[১৪]

কাব্যজগতে প্রকৃতি নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ। কবির লেখনীতে কখনো সে নায়ক, কখনো নায়িকা, কখনো স্বতন্ত্র চরিত্র, কখনো বা বর্ণনা মাধুর্য সৃষ্টিতে অন্যতম উপকরণ হয়ে উঠেছে। প্রত্যেক কবিই তাদের কাব্যসরসতা প্রতিপাদন করতে কখনো না কখনো প্রকৃতিকে আশ্রয় করেছেন। মহাকবি কালিদাসও তার ব্যতিক্রম নন। তবে তিনি তাঁর কাব্যে বিশেষতঃ 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'-এ প্রকৃতিকে এক অন্য আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন। যে উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে মহাকবির কবিসত্তাকে অতিক্রম করে প্রকাশিত হয়েছে এক পরিবেশ সচেতন বান্ধব-সত্তা। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়– অভিজ্ঞানশকুন্তলমে শকুন্তলা, দুষ্যন্ত, কণ্বমুনি, অনসূয়া-প্রিয়ংবদা প্রভৃতি চরিত্রের মত তপোবনপ্রকৃতিও একজন বিশেষ পাত্র। প্রকৃতিকে মানব করে তুলে তার মুখে বাক্যধ্বনির মধ্য দিয়ে তাকে এমন সজীব, এমন প্রত্যক্ষ, এমন ব্যাপক, এমন অন্তরঙ্গ করে তোলার অনন্য নিদর্শন সত্যই অভূতপূর্ব।

তথ্যসূত্র:

১। পাল, ড. গৌতম। পরিবেশ ও দূষণ: পরিবেশ বিজ্ঞান। ৩য় সংস্করণ, দাসগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ১৯।

২। চক্রবর্তী, শম্ভুনাথ সাংখ্যতীর্থ রচিত ও সম্পাদিত। মহাকাব্য নিবন্ধাবলী। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, পৃ. ৪১০।

৩। তদেব, পৃ. ৪১০।

৪। কালিদাস। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্। সম্পাদনা ড. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, চতুর্থ সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃ. ১৩৪।

৫। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্', ১ম অঙ্ক, শ্লোক-১।

৬। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'- নাটক, প্রথমাঙ্ক।

৭। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'- নাটক, প্রথমাঙ্ক।

৮। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্', চতুর্থ অঙ্ক, শ্লোক-১২।

৯। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'- নাটক, প্রথমাঙ্ক।

১০। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'- নাটক, সপ্তম অঙ্ক।

১১। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'- নাটক, প্রথমাঙ্ক, শ্লোক-১৪।

১২। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'- নাটক, চতুর্থ অঙ্ক, শ্লোক-১৪।

১৩। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'- নাটক, প্রথমাঙ্ক।

১৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক গ্যটে কৃত শকুন্তলা প্রশস্তির অনুবাদ।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. কালিদাস। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'। সম্পাদনা ড. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, তৃতীয় সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪ই মার্চ, ১৯৯৬।

২. কালিদাস। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'। সম্পাদনা আচার্য রাম নারায়ণ, বোম্বাই, ১৯৪৭।

৩. কালিদাস। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'। সম্পাদনা জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, পঞ্চম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯১৪।

৪. কালিদাস। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'। সম্পাদনা এ. বি. গজেন্দ্রগদকর, সপ্তম সংস্করণ, দি পপুলার পাবলিশিং হাউস, সুরাট, ১৯৬২।

৫. পাল, গৌতম ডঃ। পরিবেশ ও দূষণ: পরিবেশ বিজ্ঞান। তৃতীয় সংস্করণ, দাশগুপ্ত অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১০।

৬. মুখোপাধ্যায়, আনন্দদেব ও চন্দ, বিনয় সম্পাদিত। পরিবেশ প্রসঙ্গ (দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথমভাগ)। চতুর্থ সংস্করণ, অভীক পাবলিকেশনস্, ২০১১।

৭. ঘোষ, বিদ্যুৎবরণ। সংস্কৃত-রচনায় প্রতিফলিত পরিবেশ সচেতনতা। দ্বিতীয় সংস্করণ-সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১১।

৮. চক্রবর্তী, শম্ভুনাথ। মহাকাব্য নিবন্ধাবলী। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৩।